বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ

কতিপয় প্রসঙ্গ

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ : কতিপয় প্রসঙ্গ
বিভূতিভূষণ মণ্ডল

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Bangla Sahitte Deshbhag by Bibhuti Bhushan Mandal Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98112-6-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

সৌহার্দ্য মণ্ডল
কল্যাণীয়েষু

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ধর্মে-গোত্রে-বর্ণে বিভাজন
জগতে অমঙ্গল যা কিছু, যা কিছু অশুভ লক্ষণ,
যে কাঁটা মনুষ্যত্বের পথ রুদ্ধ করে রাখে
তুলে ফেলো; দীপ জ্বালো অন্ধকার চেতনার বাঁকে।
মানুষকে মানুষ ভেবো, আর কোনো পরিচয় নয়—
এই আশীর্বাদ—'তোমার জয় তো আমারই জয়।'

প্রাক্‌কথন

দুপার বাংলাতেই দেশভাগ, বাঙালির কাছে মূলত বাংলাভাগ নিয়ে নানামাত্রিক চর্চা ও গবেষণা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে কখনো কখনো এমনটিও মনে হয়, যেন দেশভাগচর্চা হঠাৎ প্রাপ্ত গতি নিয়ে ছুটে চলেছে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো। পশ্চিমবঙ্গে দেশভাগচর্চা কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বা অ্যাকাডেমিক কর্মযজ্ঞেই সীমাবদ্ধ নয়, এসবের বাইরেও অনেক সাধারণ মানুষ এবং অপেশাদার গবেষক এই চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তাদের গবেষণায় দেশভাগের নানামাত্রিক কারণ ও চেহারা উঠে আসছে। অনেক অপ্রকাশিত সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্ববাংলায় তথা আজকের বাংলাদেশে দেশভাগচর্চা বহুলাংশেই প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অ্যাকাডেমিক বৃত্তেই গণ্ডিবদ্ধ। ফলে নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে এই চর্চার খবর বেশি মানুষ জানতে পারেন না। দেশভাগের 'পণ্ডিতি চর্চা' যেমন সাধারণ মানুষকে সংশ্লিষ্ট করতে পারছে না তেমনি কী এক অদৃশ্য কারণে সাধারণ মানুষও এই চর্চায় অনেকখানি নিস্পৃহ। একটি সময় ছিল যখন দেশভাগচর্চাকে কেমন যেন একটি নিষিদ্ধ সত্যের মতো মনে করা হতো। যেন সেই সত্য গোপন থাকাই ভালো, প্রকাশিত হলেই সমূহ সর্বনাশ। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'র মতো। তাই তো বিষয়টি নিয়ে চর্চাও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বাধা ও অসহযোগিতাও ছিল। এখন দেশভাগচর্চায় সেই অর্থে তেমন কোনো বাধা নেই। ভারত এবং বাংলাদেশের বাইরে (পাকিস্তানের খবর আমাদের বিশেষ জানা নেই) বিদেশের গবেষকরাও ভারতভাগ তথা দেশভাগ নিয়ে গবেষণা করছেন। দুদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশভাগ নিয়ে বিভিন্ন কোর্স পড়ানো হচ্ছে। দেশভাগের সাহিত্য নামে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারাই গড়ে উঠেছে, সেই সাহিত্য সিলেবাসের অন্তর্ভুক্তও হচ্ছে। এতসব ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে কেন যেন দেশভাগচর্চা বা গবেষণা যথেষ্ঠ নয়। কোথাও কি কোনো ভয় বা গোপন সত্য লুকিয়ে আছে? বাংলাদেশে একজন কবি, গল্পকার বা ঔপন্যাসিক বিরল যিনি দেশভাগের পটভূমিতে একাধিক কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লিখেছেন। বরং এমন অনেক কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিকের নামোল্লেখ করা যাবে যারা দেশভাগ নিয়ে কিছুই লেখেননি। কোনো কোনো লেখকের উপন্যাস দেশভাগের ছায়াকে ধারণ করলেও তা কায়া হয়ে উঠতে পারেনি। মুষ্টিমেয় সংখ্যক উপন্যাসকে দেশভাগের উপন্যাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া গেলেও দেশভাগের মতো পূর্বাপর সুদূরবিস্তারী অভিঘাতকে ধারণ করার জন্য সেগুলো যথেষ্ঠ নয়।

দেশভাগ নিয়ে পশ্চিমবাংলার সাহিত্য যতটা মুখর সেই তুলনায় পূর্ববাংলার সাহিত্য কেন অধিকতর নীরব এই প্রসঙ্গে কিছু কথা তো বলা যায়ই, বলেছেনও বিভিন্ন গবেষক ও বিশ্লেষক। পূর্ববাংলা থেকে যে-সকল হিন্দু উদ্বাস্তু শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবাংলায় গিয়েছেন তাদের একটি বড় অংশকেই টিকে থাকার জন্য মরণপণ অমানবিক এক লড়াই করতে হয়েছে। তথাকথিত স্বদেশ এবং স্বজাতি তাদের প্রতি যথেষ্ট মানবিক আচরণ করেনি। একদিকে হারানোর হাহাকার, অপরদিকে না পাওয়ার বেদনা, বাঙালদের প্রতি ঘটিদের চরম উন্নাসিকতা, অসম্মান এবং অবহেলা পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের মনে যে বেদনা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে সেই বোধ থেকেও, একটু ধাতস্থ হবার পরে, তারা কলম ধরেছেন। নিজেদের দুঃখ কষ্ট হতাশা বেদনা প্রকাশের ভাষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেরই ছিল। একটি সময়ে দেশভাগচর্চায় নিম্নবর্ণ এবং নিম্নবর্গের মানুষের দুঃখ দুর্দশা জীবনচিত্রের খবর কমই জানা যেত। উচ্চবর্গীয়দের কলমে এদের কথা খুব সামান্যই লেখা হতো। পশ্চাৎপদ অশিক্ষিত তথাকথিত এই নিম্নবর্গের মানুষ পরবর্তী সময়ে নিজেরাই নিজেদের কথা লিখতে শুরু করেন। বর্তমানে 'দেশভাগের সাহিত্য' বলে যে সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হয় সেই সাহিত্যে এই নিম্নবর্গের লেখক ও মানুষের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে ভারত থেকে যেসব বাঙালি মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে এলেন তাদের শিক্ষিত অংশ সহজেই শূন্যস্থান পূরণ করার মতো হিন্দুদের ফেলে যাওয়া চাকরি ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুনর্বাসিত হয়ে দেশভাগের ক্ষত ও ক্ষতিকে অনেকাংশেই পুষিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানকে 'সব পেয়েছির দেশ' মনে করে দুঃখ ভুলতে পেরেছিলেন। ফলে কেউ কেউ মনে করেন, অতীতের স্মৃতি ও সমৃদ্ধি তাদের অতটা তাড়িত ও ভাবিত করেনি। তাই তারা লিখতেও উদ্বুদ্ধ হননি। পূর্ববাংলা থেকে যত সংখ্যক হিন্দু ভারতে গিয়েছেন সেই তুলনায় কম সংখ্যক মুসলমান ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছেন। ফলে ভারত থেকে আসা সাধারণ মুসলমানরাও যত সহজে ফাঁকা ঘরবাড়ি জায়গাজমি পেয়েছিলেন সেই তুলনায় পূর্ববাংলা থেকে চলে যাওয়া হিন্দুরা ভারতে কম বাড়িঘর জায়গাজমি ফাঁকা পেয়েছিলেন। তবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জবরদখলের লড়াই উভয় পক্ষকেই কমবেশি করতে হয়েছিল। এই হিসেবেই দেশত্যাগী, দেশছাড়া, দেশহারা, দেশভিখারি দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি দুঃখ-কষ্ট বেদনার মাত্রান্তর ঘটেছে। পূর্ববাংলার সাহিত্যে দেশভাগচর্চার নীরবতার এবং পশ্চিমবাংলার সাহিত্যে মুখরতার এটিও একটি অন্যতম কারণ। এছাড়া অবাঙালি উর্দুভাষী যে-সকল মুসলমান মোহাজের ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছে তাদের একটি বড় অংশই ছিল অক্ষরপরিচয়হীন। সুতরাং দুঃখ-কষ্টের বাণীরূপ দেবার যোগ্যতা তাদের ছিল না। তাছাড়াও ভাষাগত একটি সমস্যা তো ছিলই। তবে মজার ব্যাপার হলো এই যে, ধর্মের নিরিখে দেশভাগ হলেও একই ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু ঘটি-বাঙাল এবং মুসলিম বাঙালি-মোহাজের, বলতে গেলে

আজও পর্যন্ত অন্তরের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারেনি। সে যাই হোক, উভয় দেশেই একদা দেশভাগচর্চার ঝুঁকির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দেশভাগের পেছনে সাধারণ্যে অদৃশ্য এমন কিছু নির্মম সত্য, রূঢ় বাস্তবতা আছে যেগুলো সামনে টেনে আনলে নতুন করে আবার সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেবার সম্ভাবনা ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে। সে কারণে দেশভাগ নিয়ে নিরপেক্ষ কিংবা নিরেট সৎ ও সত্য সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া কঠিন, হয়ওনি বলে মনে করেন গবেষক-বিশ্লেষকরা। এই ভয় কিংবা সাবধানতা থেকেই কবি-লেখকরা দেশভাগ নিয়ে কবিতা-গল্প-উপন্যাস লিখতে গিয়ে কৌশলী ভূমিকা নিয়ে থাকেন, মধ্য কিংবা নরমপন্থা অবলম্বন করেন। সংকট যাতে ঘনীভূত না হয়ে উঠতে পারে কাহিনি সেইভাবে সাজিয়ে থাকেন। সমাপ্তিপর্বে এসে ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চাদরে মুড়ে দেবার চেষ্টা করেন। এই কারণে দেশভাগ বিষয়ক সাহিত্যে স্মৃতিমেদুরতা, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, উদ্বাস্তুজীবনের দুর্দশা নির্মমতার কথা যতটা আছে, দেশভাগের চূড়ান্ত কারণ—সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা ও দাঙ্গাসংশ্লিষ্ট উৎপীড়নের কথা সেই তুলনায় খুব সামান্যই আছে, কোথাও কোথাও প্রায় নেই বললেও চলে। এই না-থাকাটা শান্তি ও সহাবস্থানের জন্য মঙ্গলজনক কিন্তু নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ, ইতিহাসের মিথ্যাচার।

স্বাধীন বাংলাদেশে আটকে পড়া উর্দুভাষী মোহাজেররাই যেন দেশভাগের ভাগফলের ভাগশেষ কিংবা অবশিষ্টাংশ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ভারতের বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি এলাকা থেকে উর্দুভাষী মুসলমানরা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। এদের মধ্যে সম্ভবত বিহারের অধিবাসীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গড়পড়তা এদের সবাইকেই বিহারি বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গার হিন্দু-মুসলমান এবং বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় এরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুটমিলের শ্রমিকদের একটি বড় অংশ ছিল এরাই। এরা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করত। সেই কারণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিহারিদের একটি অংশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাদের সহযোগী হয়ে বাঙালি নিধনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অসম্মানজনক আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে দেশে ফিরে গেলেও বিহারিদের কথা পাকিস্তান সরকার ভাবেনি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য এরা মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় বাঙালিদের তীব্র আক্রোশের মুখে পড়ে। এদের অনেকেই আহত এবং নিহত হয়। কেউ কেউ গোপনে কোনোভাবে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অধিকাংশই আটকে পড়ে বাংলাদেশে। এরা এখনও বাংলাদেশে নাগরিক পরিচয়হীন। সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে এরা এখনও চরম দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। এদের অতি ক্ষুদ্র অংশ বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি গ্রহণের মাধ্যমে, প্রজন্মান্তরে

বাংলাদেশের মূল স্রোতে মিশে যাবার চেষ্টায় কিছুটা সফল হলেও অধিকাংশই চরমভাবে মানবেতর ক্যাম্পবন্দি জীবনযাপন করছে। নিরক্ষরতার গভীর অন্ধকার এদের চারপাশজুড়ে। দেশভাগের এই অভিশপ্ত সন্তানরা বিধ্বংসী এমনকি আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কী পরিণতি বয়ে এনেছে সেসব কথা পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে খুব সামান্যই। এই আটকে পড়া পাকিস্তানি কিংবা দেশভাগের মোহাজেরদের নিয়ে বাংলাদেশে বলতে গেলে একমাত্র উপন্যাস লিখেছেন বিশিষ্ট লেখক হরিপদ দত্ত *মোহাজের* (২০০৬) নামে। এছাড়া আনোয়ারা আজাদ *বিহারি বৃত্তান্ত* (২০১৭) নামেও একটি উপন্যাস লিখেছেন। আনোয়ারা আজাদের উপন্যাসে হরিপদ দত্তের উপন্যাসের প্রভাব কোথাও পরোক্ষ এবং কোথাও প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেটা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেমনই হোক। *বিহারি বৃত্তান্ত* উপন্যাস হিসেবে সফল এবং উল্লেখযোগ্য না হলেও উদাহরণ হিসেবে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে দেশভাগের সাহিত্যে এই বোধহয় একটা অনালোকিত চিত্র।

দেশাভাগের তীব্র আঁচড় এবং প্রবল দহন সরাসরি যাদের গায়ে লেগেছিল সেই প্রজন্মের মানুষ ক্রমশ বিলীয়মান। অনেকেই আবার বয়সের ভারে স্মৃতিভ্রষ্ট। এদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষও সময়ের মাপে দূরবর্তী স্থানে থেকে দেশভাগ নিয়ে সাহিত্য সৃজন করেছেন, করে চলেছেন। তৃতীয় প্রজন্মেরও অনেকে দেশভাগ নিয়ে লিখছেন। আবার কোনো পত্রিকার সম্পাদক কিংবা কোনো গ্রন্থের সংকলক তাদের দিয়ে লিখিয়েও নিচ্ছেন। এই লেখায় গভীরতা এবং অন্তরের স্পর্শ স্বাভাবিকভাবেই কম থাকার কথা। কেননা শেকড়ছেঁড়া মানুষের বেদনা শেকড়গাঁথা মানুষের পক্ষে সবটুকু ধারণ করা অসম্ভব। অনেকেই আবার দেশভাগকে ভুলিয়ে দিতে চান, অনেকেই নিজের থেকে ভুলে যেতে/থাকতে চান। অনেকেই পূর্বপুরুষের শেকড় থেকে উন্মূল হবার মর্মান্তিক ইতিহাস অস্বীকার করে মূলস্রোতের মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। সম্প্রতি বাংলাদেশের এই প্রজন্মের তরুণ কবি ও সম্পাদক মাহফুজ রিপনের সম্পাদনায় *ব্যাটিংজোন* (২০২২) লিটল ম্যাগাজিনের দেশভাগ সংখ্যায় দেশভাগ বিষয়ক একশটির মতো কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এক কথায় এই সংকলনের সকল কবিই এই প্রজন্মের মানুষ। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। দেশভাগচর্চায় নতুন অভিজ্ঞান। এবং বাংলাদেশে কোনো লিটল ম্যাগাজিনের এই রকম একটি সংখ্যা প্রকাশ এই-ই প্রথম। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণ কবি ও সম্পাদক তন্ময় ভট্টাচার্যের সংকলন ও সম্পাদনায় নির্বাচিত কবিতা ও গান নিয়ে *দেশভাগ এবং* (২০২২) নামে বৃহদাকার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে অবশ্য প্রবীণ কবি ও গীতিকারের পাশাপাশি ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশকের কবিদের কবিতাও সংকলিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত দুটি সংকলনের কবিদের একটি বৃহৎ অংশেরই দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তবে তৃতীয় প্রজন্মের চোখে

দেশভাগ দেখার একটি দর্পণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এইসব কবিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর *দেশভাগের কবিতা* (২০১০) এবং বাংলাদেশের বিভূতিভূষণ মণ্ডলের সম্পাদিত *ভাঙাবাংলার পদাবলী* (২০১৩) গ্রন্থ দুটিতে দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যেসব কবি, মূলত তাদের কবিতাই সংকলিত হয়েছে। দেশভাগের সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে ছোটগল্প নিয়ে। সংখ্যাধিক্যের কারণে সেই উদাহরণ থেকে বিরত থাকা হলো।

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ : কতিপয় প্রসঙ্গ গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলো বাংলাদেশের *শব্দঘর*, *নতুন দিগন্ত*, *ভোরের কাগজ ঈদসংখ্যা*, *অঞ্জলি*, *নিরিখ*, *রিভিউ*, *ব্যাটিংজোন*, *পশ্চিমবঙ্গের একুশশতক*, *সমকালের জিয়নকাঠি*, *অভিমুখ সুন্দরবন*, *যামিনীকথা*, ত্রিপুরার Arts and Social Science Forum of North East-এর *বালাক* প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিন এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অভিসন্দর্ভ ও ব্রজলাল কলেজের জার্নাল প্রভৃতি গবেষণাপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধই দেশভাগের সূত্রে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। দেশভাগ নিয়ে আমার প্রথম গ্রন্থ *ভাঙাবাংলার পদাবলী* (২০১৩) দেশভাগ বিষয়ক কবিতার একটি সংকলন। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দেশভাগ বিষয়ক কবিতার এটাই প্রথম সংকলন। এই কবিতাগুলোই পরবর্তীকালে আমাকে প্রবন্ধ রচনার রসদ সরবরাহ করে। আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ *দেশভাগের নির্বাচিত গান* (২০২২)। এটাই দুপার বাংলাতেই দেশভাগ বিষয়ক গানের সম্ভবত প্রথম একক কোনো সংকলন। এই গানগুলোও আমাকে প্রবন্ধ লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণায় যুক্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের গবেষণা জার্নালের জন্য লিখেছিলাম 'পূর্ববাংলার কবিতায় পাকিস্তান চেতনা' প্রবন্ধটি। প্রতিষ্ঠান প্রভুর অকারণ অমায়িক দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে আত্মসম্মান রক্ষার্থে মাঝপথে গবেষণা ছেড়ে চলে এলে প্রবন্ধটির ভাগ্য সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীকালে খুলনার ব্রজলাল কলেজের গবেষণাপত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংকলিত মনোজ বসু এবং প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ বিষয়ক প্রবন্ধ দুটি আমার *প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-নজরুল ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (২০১৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক এবং বিষয়-সাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রবন্ধ দুটি এই সংকলনে পুনর্বার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। কবি হৃষিকেশ হালদার দেশভাগ নিয়ে *কাঁটাতারের বেহালা* (২০১৮) নামে গোটা একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। এমন দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে বিরল। সে কারণে তাঁর কবিতা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা গেল। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, তানভীর মোকাম্মেল এবং চন্দন আনোয়ার এই তিন লেখকের উপন্যাসে এই সময়ের চোখে দেশভাগ দেখার জন্য তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হলো। দেশভাগে দেশহারাদের স্মৃতিকাতর প্রতিনিধি বিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রের স্মৃতিভাষ্যে দেখার চেষ্টা করা হলো দেশভাগের পূর্বাপর জীবনবাস্তবতার ছবি।

দেশহারা উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রামের করুণ ও নির্মম কথাচিত্র মনোরঞ্জন ব্যাপারীর *ইতিবৃত্তে চণ্ডালজীবন* নিয়েও রইলো একটি আলোচনা।

বাংলা ভাষায় দেশভাগচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ লেখক ও গবেষক মধুময় পাল, মধুময়দা, কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে আমাকে দেশভাগচর্চায় সাহস ও উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন। তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। খুলনার ব্রজলাল কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শংকরকুমার মল্লিক এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ড. রুবেল আনছারের আন্তরিক ভালোবাসাও আমার দেশভাগচর্চার অনুপ্রেরণা। পুস্তক প্রকাশনার সংকটপূর্ণ সময়ে আমার প্রিয়ভাজন ছাত্র, এই প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সম্পাদক-প্রকাশক, কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদ গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমার দেশভাগচর্চার সাক্ষী হয়ে রইলেন। তাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। বইটির অক্ষরবিন্যাসশিল্পী স্নেহভাজন দেবাশীষ দে দেবুর জন্যও আন্তরিক শুভকামনা। শিউলি মণ্ডল, যার কাছ থেকে ঋণ করা সময় এই বইতে জমা হয়ে থাকল, তাকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের মঙ্গল হোক।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

ইংরেজি বিভাগ
শহীদ আবুল কাশেম কলেজ
কৈয়াবাজার, হরিণটানা,
খুলনা।

সূচিপত্র

বাংলা কবিতায় দেশভাগ ১৩
দেশভাগ : পূর্ববাংলার কবিতায় পাকিস্তান চেতনা ৪৪
দেশভাগ, হৃষিকেশ হালদার এবং তাঁর কবিতা ৭৪
মনোজ বসুর ছোটগল্পে দেশভাগ ৮১
প্রফুল্ল রায়ের ছোটগল্পে দেশভাগ ৯১
উজানতলির উপকথা : দেশভাগের নিম্নবর্গীয় উপাখ্যান ৯৯
বিষাদনদী : দেশভাগের এক বিষণ্ণপ্রবাহ ১১৬
মোহাজের : দেশভাগের ভাগশেষ ১৩৭
অর্পিত জীবন : দেশভাগ পরবর্তী পূর্ববঙ্গীয় বাস্তবতা ১৫১
দেশভাগের গান : বাংলা গানে দেশভাগ ১৭২
মনোজ মিত্রের স্মৃতিভাষ্যে দেশভাগের পূর্বাপর ১৯২
দেশভাগ : চণ্ডালজীবনের ইতিবৃত্ত ২০০

বাংলা কবিতায় দেশভাগ

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পের মতো কবিতাও দেশভাগকে ধারণ করেছে বিভিন্ন প্রেক্ষপটে। ইতিহাসের দেশভাগ আর কবিতার দেশভাগ যদিও এক নয় তবু ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই দেশভাগের কবিতা ঋদ্ধ হয়েছে। পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বলা যেতে পারে, দেশভাগের কবিতা দেশভাগেরই গর্ভজাত ফসল। দেশভাগ বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতাকে 'দেশভাগ' শব্দটি উপহার দিয়েছে। দেশভাগের কবিতাগুলো লেখা হয়েছে দেশভাগের পরপরই, কোনো কোনোটি আবার অনেক পরে। যারা এই কবিতাগুলো লিখেছেন তাদের অনেকেই দেশভাগের শিকার। কেউ কেউ দেশভাগের সময় অপরিণত বয়স্ক এবং অপরিণতমনস্ক ছিলেন। শিশুমনে দেশভাগের যে ক্ষত তৈরি হয়েছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তার ঘটেছিল তাদের চেতনায়। আবার কেউ কেউ দেশভাগে দেশহারা ও দিশেহারা হয়ে নতুন দেশে এসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন ন্যূনতম একটু শেকড় গাড়ার সাধনায়। একটু থিতু হয়ে বসার পর, পরবাসী হয়ে স্বদেশিদের সঙ্গে অবস্থানগত নানান ব্যবধান—তাদের দেশ হারানোর বেদনা ও ক্ষতকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই যন্ত্রণার অনুভূতি তীব্র থেকে ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। ফলে কোনো কোনো কবিতার জন্ম হয়েছে কবির পরিণত মানসে—তাৎক্ষণিক আবেগ বা হাহাকার থেকে নয় এবং এসব আবেগ, হাহাকার, আর্তি আর ব্যক্তিগত থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে দেশভাগের শিকার আপামর মানুষের—যে রোদন, যে হাহাকার বংশানুক্রমে ধ্বনিত হতে থাকবে বহুদিন। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, এক পক্ষের হিংসা-ক্রোধের রোষানলে পড়ে আরেকটি পক্ষকে দেশ মাটি বাস্তুভিটে ছাড়তে হয়েছে সত্যি—আবার সেই বিরোধীপক্ষেরই কেউ কেউ তাদের রক্ষা করার মানসে প্রাণপাত করেছে, নির্ভরতা দিয়ে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছে, এবং যখন একেবারেই তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরাপদে তাদের দেশত্যাগে সাহায্য করেছে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে প্রিয়জন বিদায়ের দুঃখে অশ্রুপূর্ণ রোদন করেছে। যারা দেশ ছেড়ে গেছেন বিদায় বেলায় তাদের জলভরা চোখে বারবার ভেসে উঠেছে শুধুই সুখস্মৃতি, ভালো লাগার অনুভূতিগুলো—সেই স্মৃতিকাতরতায় হিংসা-ঘৃণার জায়গাটি খুব কম। যারা রয়ে গেছে তারাও বুকে আগলে রেখেছে চলে যাওয়া মানুষের স্মৃতিগুলো। তবে দেশত্যাগের পূর্বে বা দেশত্যাগের প্রধান কারণ হিসেবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ স্মৃতি কখনো কখনো

তাদের দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে ফিরেছে। সামগ্রিক বিচারে প্রতিটি কবিতারই উচ্চারণ বড় শান্ত-সমাহিত—যদিও বেদনার জায়গাটি খুব গভীর। দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় মানবতা লাঞ্ছিত হয়েছে, বিবেক অপসৃত হয়েছে—তারপরও কোথায় যেন সূক্ষ্ম একটি আলোকরেখা সততই মানুষের দিশারি হয়েছে, মানুষকে সম্পূর্ণরূপে অমানুষ হতে দেয়নি। দেশভাগের কবিতাগুচ্ছ মূলত এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে দেশভাগ যথার্থ গভীরতা, ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত ও উপস্থাপিত হয়নি বলে এক ধরনের খেদ ও ক্ষোভের কথা শোনা যায়। আরও বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা উপন্যাস এবং ছোটগল্প দেশভাগ বিষয়ে যতটা মুখর বাংলা কবিতা সেই তুলনায় অধিকতর নীরব। এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। দেশভাগের পূর্বাপর জীবনকাল এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য কোনো কোনো কবি দেশভাগ নিয়ে কবিতা লেখেননি, অন্তত অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। এঁদের মধ্যে আছেন অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫), আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-১৯৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০, সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), বিনয় মজুমদার (১৯৩৪-২০০৬) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম দেশভাগের আগেই অসুস্থ এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। বাকিদের মধ্যে, বিশেষত ধর্মীয় পরিচয়ে যারা মুসলমান তাদের অন্তরে পাকিস্তান চেতনা এত বেশি ক্রিয়াশীল ছিল যে দেশভাগকে তারা ইতিবাচক অর্থে দেখেছিলেন এবং সেই কারণে দেশভাগের অভিঘাত তাদেরকে বিশেষ বিচলিত করেনি। এমনকি পাকিস্তান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পাকিস্তান এবং জিন্নাহর প্রশস্তি বন্দনা করে কবিতা লিখেছেন। পাকিস্তানি জজবায় দ্বারা আক্রান্ত হবার কারণে বাঙালি মুসলমান কবিদের কবিতায় দেশভাগ প্রায় অনুপস্থিত। দেশভাগের পূর্বাপর জীবনকালের অগ্রগণ্য হিন্দু কবিদের অনেকেই কেন দেশভাগ নিয়ে কবিতা লেখেননি তারও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে এই সকল কবির নীরবতা বাংলা কবিতায় দেশভাগের উপস্থিতিকে একেবারে ম্লান করে দিতে পারেনি, অনেকেই তাদের কবিতায় দেশভাগের অভিঘাতকে ধারণ করেছেন, দেশভাগের পূর্বাপর পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছেন এবং বাংলা কবিতাকে দেশভাগচর্চাহীনতার অভিযোগ থেকে দায়মুক্ত করেছেন।

সংকলনগ্রন্থ, কবির কাব্যগ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে দেশভাগ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সে হিসেবে দেখা যায় যে, কোনো কোনো কবি দুইটি[১] বা ততোধিক[২] কবিতাও লিখেছেন দেশভাগের প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিয়ে। এই তালিকায় বিশিষ্ট বিখ্যাত অগ্রগণ্য কবি যেমন আছেন তেমনি আছেন অখ্যাত অর্বাচীন কবিও। শিল্পবিচারে সকল কবির কবিতা নিশ্চয়ই শিল্পোত্তীর্ণ বা সার্থক নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে সকলেই যে সাধ্যমতো নিজের নিজের আবেগ উচ্ছ্বাস ক্ষোভ অভিযোগ অভিমান প্রকাশের চেষ্টা করেছেন এবং সেক্ষেত্রে তারা যে সফলও তা বেশ জোর দিয়েই বলা যায়। মূলত কবি নন, গদ্যশিল্পী, এমনও কেউ কেউ দেশভাগের প্রতিক্রিয়ায় কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন[৩]। দেশভাগ বিষয়ক সংগৃহীত কবিতাগুলো পাঠ ও পর্যালোচনা করলে দেশভাগের পূর্বাপর ইতিহাসের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় ইতিহাসে না-লেখা এমন কিছু বিষয় যা মূলত কবির চোখেই দেখা সম্ভব। ইতিহাস দেখে ঘটে যাওয়া ঘটনা, কবি দেখেন সম্ভাব্য পরিণতি, পরবর্তীকালে যা ইতিহাসে লেখা হবে। তবে দেশভাগের কবিতাগুলোতে ইতিহাসের উপাদানই বেশি অর্থাৎ কবিতাগুলো মূলত ইতিহাসের ঘটনাশ্রয়ী। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং জীবনদর্শন। কবিতাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে বিষয়বস্তু অনুসারে বিভিন্ন প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দাঙ্গা ও দেশভাগ

সাতচল্লিশে দেশভাগের আগে থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ—হিন্দু এবং মুসলমান, বিভিন্ন কারণে পরস্পরের প্রতি বিরূপ, সংশয়ী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই সকল অসন্তোষের আগুনে জ্বালানি জোগান দেয় ব্রিটিশ সরকার। তারপর কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ দাবি—অধিকারের দড়ি টানাটানি খেলায় এতটাই মত্ত এবং উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে, প্রকাশ্যেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছেচল্লিশের দাঙ্গা। বিশেষত বিহার এবং নোয়াখালীর দাঙ্গা দেশভাগের অপরিহার্যতাকে প্রকটিত করে তোলে। এই দাঙ্গা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, ভারত-পাকিস্তানের ভাবী বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের আর কোনো বিকল্প পথ খোলা রইল না। এই দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানকে কতখানি শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল, কত ধ্বংস এবং মৃত্যু ঘটিয়েছিল, পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী করে তুলেছিল সেসব চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন কবিতায়। অথচ দীর্ঘকাল ধরে বংশপরম্পরায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি নিয়ে। ভালোবাসার পাত্রটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানে। নোয়াখালীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং পরবর্তীকালের হিংসা-বিদ্বেষের চিত্র পাওয়া যায় 'নোয়াখালী' নামক কবিতায়।

হিংস্র নোয়াখালী,
সারা ভারতের মুখে মাখায়েছো ঘোর কলঙ্ক কালি।
হাজারো বছর গলাগলি ধরি হিন্দু-মুসলমান,
কাকা, চাচা, চাচি, দাদা, নানা, নানী সম্ভাষ প্রতিদান।
সুখে ও দুঃখে শ্মশানে ও গোরে ভোজে আর জিয়াফতে
আমোদৎসবে আড়ং-এ মেলায় মিলিমিশি কত মতে।
পুরুষ পরম্পরায় যাহারা প্রতিবেশী আত্মীয়,
ধর্মে-সমাজে পৃথক হলেও দেহে-প্রাণে সব প্রিয়।
আল্লাহ থাকেন মসজিদে আর শ্রীহরি মন্দিরে
পূজা ও মানতে শিরনি দিয়েছে ধুলা মাখিয়াছে শিরে—
তাহাদের মাঝে কেমনে আসিল হিংসার দুশমন,
আত্মীয়তার অমৃত তাদের কে করিল লুণ্ঠন?[৪]

বাংলা কবিতায় বিহারের দাঙ্গার চিত্র বিশেষ পাওয়া যায় না। তবে বিহার এবং নোয়াখালীর দাঙ্গা ছিল মূলত একতরফা হামলা ও আক্রমণ। বিহারে হিন্দুর হাতে মুসলমান এবং নোয়াখালীতে মুসলমানের হাতে হিন্দু নিধনের যে ঘটনা ঘটেছিল তা গোটা ভারতবর্ষের ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই দাঙ্গার স্রোত বিভিন্ন চেহারা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

দেশজুড়ে হলো হানাহানি, মারামারি—
একে একে সব বন্ধু স্বজন ছেড়ে চলে গেল বাড়ি।
জ্বলিল আগুন দাউ দাউ দাউ, রক্ত-গঙ্গা চলে;
যারা না পালালো, প্রাণ দিল দলে দলে।
মানুষ সে হলো শয়তান যেন, বন্ধু হইল খুনি
একই দুর্দশা বরণ করিল জ্ঞানী, ধনী, মানী, গুণী।
অজাতশত্রু কানুর পিতাও শেষে
ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল নিজ দেশে।
সোনার স্বদেশ হইল শ্মশান, স্বর্গ নরক হোলো
প্রেত-পিশাচের প্রলয় নৃত্যে দেশ করে টলোমলো[৫]।

দাঙ্গার তাণ্ডব থেকে পালিয়ে বাঁচতে গিয়েও ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছে অনেকে। চোখ বন্ধ করে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে দাঙ্গার ভয়াবহতা, হত্যা, ধ্বংস, লাশ, রক্ত। কিন্তু পালাতে গিয়েও বাধা আসে। সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করতে হয় পলাতককে। প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেও প্রতিবাদ তো দূরের কথা সামান্য অনুশোচনার শব্দ উচ্চারণের সাহস ও পরিস্থিতিও থাকে না। আত্মরক্ষার্থে পালাতে গিয়ে ধর্ষিতা নিহত মেয়ের মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কোনো পিতা বলেন—'ধইর‍্যা নেওনা যমুনারে কুমইরে নিছে'[৬]। হয়তো কোনো পরিবারের কোনোমতে বেঁচে যাওয়া কিশোরটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখছে তার আত্মজনের নিগ্রহ।

একটি কিশোর ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখছিল
মা ও বোনের ধর্ষিত হওয়া
তখনও একটু একটু নড়ছিল বাবার ধড়
একটি বউ দেখছিল তার এক বছরের বাচ্চাকে একজন
ছুড়ে দিল খোড়ো ঘরের দাউ দাউ আগুনে
একের পর এক বুকে উঠছে গাঁয়ের পরিচিত ছেলে বুড়ো
তাকে অপলক দেখছে স্বামীর কাটামুণ্ডুর চোখ[৭]।

একটি দাঙ্গা রাতারাতি বন্ধুকে শত্রু করে দিল। প্রতিবেশীকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে দিল। মানুষকে অন্ধ-মূক ও বধির করে দিল। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়াল না কেউ, ঘরের আগুন নেভাতে এলো না কোনো বন্ধু, নিরাপত্তার বরাভয় নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল না কোনো সুহৃদ। স্বদেশ এবং স্বদেশের চিরচেনা মানুষগুলো কেন এমন হয়ে গেল?

কঠিন ভ্রুভঙ্গি দেখে মায়ের আঁচলে
মুখ লুকায় শিশু।
এটি ভ্রান্তি! একি অহোরাত্র শুধু অর্থহীন বিসর্জন
স্বদেশে আমার।
কোনোদিকে বোধনের চিহ্ন নেই, কোনো
ঘরে নেই আমন্ত্রণ;
কেউ এসে দাঁড়ায় না কারও পাশে[৮]।

ধর্মের ভিত্তিতে, দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে হিন্দু-মুসলমানের জন্য আলাদা আলাদা ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে যে রক্ত এবং মৃত্যুর স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, সেই স্রোত মানুষের অন্তর্গত পুঞ্জীভূত ক্লেদ এবং জঞ্জালকে ভাসিয়ে দিতে পারেনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা থেকে কোনো শিক্ষাও নেয়নি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেপটে আছে দাঙ্গার রক্ত আর কলঙ্কের দাগ।

ধর্মান্ধতা মানুষকে কীভাবে অমানুষ করে তোলে,
একে অন্যের গলায় ছুরি চালায়, সম্ভ্রম লুট করে
সস্তা পণ্যের মতো, ভাই ভায়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে
উল্লাসে ফেটে পড়ে, এ-কথা আমরা এই উপমহাদেশের
অসহায় মানুষ জেনেছি চড়া দামের বিনিময়ে। দাঙ্গা
অসংখ্য মানুষের ঘর ভাঙার কলঙ্কিত ইতিহাসই শুধু নয়,
মানবতার কুৎসিত হন্তারকও বটে[৯]।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরায়ত বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নীল বিষে জর্জরিত হয়েছে। 'মন যখন মরুভূমি, সে দগ্ধ দিন, দুপুর/আগুন, ঘরে আগুন দেহে আগুন প্রাণ চিতায়/জীবন ফণিমনসা, তার বিষ, বিষের কাঁটায় রক্ত[১০]। তখনও হয়তো সমন্বয়বাদীরা বলেন, দেশভাগ হলেও মানুষ ও মানুষের মন ভাগ হয়নি। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, প্রথমে মানুষ ভাগ হয়েছে। তারপর ভাগ হয়েছে তাদের মন। এবং সবশেষে ভাগ হয়েছে দেশ। 'আমরা দেখলাম/প্রথমেই মানুষের রক্তে

একটা নদী হলো। সেই নদীর দু'পারে দু'টো দেশ হলো'[১১]। শুধু যে দুটো দেশই গড়ে উঠল তাই নয়, সেই নদী দিয়ে প্রবাহিত হলো লাশের ভেলা। নদীর পারে জ্বলে উঠল শ্মশানের চিতা। সেই চিতা কেবল শ্মশানেই জ্বলল না 'এই সমস্ত বুকে অসংখ্য শ্মশান জ্বেলে রাখে'[১২]। শ্মশান বিস্তৃত হতে থাকে নদীর পারজুড়ে। চিতার আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে এক বুক থেকে আরেক বুকে। তারপর ভাগাভাগির নির্মম খেলা। 'চিতাভস্ম থেকে আঁতুড় পর্যন্ত লেগে আছে দেশভাগের ছোবল'[১৩]। কাল কেউটের মতো বিষাক্ত ছোবল হানে দেশভাগ। সেই ছোবলে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয় দেশের শরীর। গণেশ বসুর ভাষায় দেশভাগ 'হাঙ্গরের দাঁতের জাজিম'[১৪]। গণেশ বসুর হাঙরের প্রসঙ্গ ধরেই যেন সাগর চকবর্তী লিখেছেন, 'নখ আর দাঁতের ধারালো নদী হয়ে ... দু'ভাগে ভাগ করে দিল তাবৎ মানুষকে'[১৫]। সেই ভাগ হয়ে যাওয়া মানুষগুলো যেন আর মানুষ রইল না। তারা হয়ে গেল 'পচা গলা মাংস মানুষের'[১৬] 'মুণ্ডুহীন ... হাড়ের ফ্রেম'[১৭] আর মেয়েগুলো হয়ে গেল 'থেতলে যাওয়া উচ্ছিন্ন পলাশ, থুবড়ে পড়া চাঁদ'[১৮]। মেয়েদের ফুলের মতো কিংবা ফসলের মতো দলিত মথিত হওয়ার আখ্যান উর্দু কবিতায়ও বর্ণিত হয়েছে মর্মস্পর্শী ভাষায়। অমৃতা প্রীতমের 'ক্ষতচিহ্ন'[১৯] কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

হিন্দু-মুসলমান এক গাঁয়ে, এক দেশে একদা সহোদরপ্রতিম প্রতিবেশী ছিল। রাজনীতির জটিল কূটচালে তাদের মধ্যে উঠল দেয়াল। অন্তরে সৃষ্টি হলো বিষের ধোঁয়া। অন্ধকার হয়ে গেল পরিপার্শ্ব। কেউ কাউকে আর ভাই বলে দেখতে পেল না। বিষের কালো ধোঁয়ায় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল, আবছা হয়ে গেল ভাইয়ের মুখচ্ছবি। এক ভাই আরেক ভাইকে হনন করার উন্মত্ত বাসনায় হন্যে হয়ে উঠল।

> মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
> ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
> ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
> হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল,[২০]

একদিন দাঙ্গা থেমে গেল। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হলো গ্রাম, জনপদ। চারদিকে সুনসান নীরবতা। কে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে? কেবল অবশিষ্ট স্মৃতিরা মৃত মানুষের মতো পড়ে রইল। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন—

> হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই; বাংলার লক্ষ গ্রাম রাত্রি একদিন
> আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
> হতে পেরেছিল প্রায়; নিভে গেছে সব।
> এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে;
> নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
> এ পাড়ার বড় মেজো... ও ... পাড়ার দুলে রোয়েদের
> ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা পেয়ে যেত
> এখন টুশব্দ নেই সেইসব পাখিদেরও;
> মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;[২১]